Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 712 - 721
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 712 - 721
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

ভেড়িহারদের জগৎ : একটি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক অধ্যয়ন

ড. নুনম মুখোপাধ্যায়
স্যাক্ট অধ্যাপক, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
Email ID : mukhopadhyaynunam@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Goth, shepherds, bagha, deroyaha, myaral, deriaon, gope, kakmara, bhakat.

Abstract
After independence, Bengali literature witnessed the opening of new horizons. Moving beyond the secure narratives of elite society, writers began to explore the real struggles of life. The lives of people living in rural and peripheral regions emerged as an infinite source of new themes in literature. The depiction of marginalized people's daily lives became a prominent subject. One such novel is Bhagirath Mishra's 'Charanbhumi' (1994), which centers around a group of shepherds (sheepherders) leading an uncertain and insecure nomadic life. They take shelter with a certain number of sheep and keep moving indefinitely, caught in the bondage of circumstances. Themes such as love, trust, and above all, political upheavals run through the novel.

Several critical questions arise from this work : What exactly is a "goth" (a nomadic settlement or camp)? What are the unique characteristics of diverse 'goth' cultures? What is the lifestyle in these "goth"s? How is the shepherd society structured? This essay attempts to address these questions.

The post-independence period was marked by significant political and social changes, including the abolition of the Zamindari system, the transformation of feudal structures, establishment of Panchayat systems, the rise of Naxalite, peasant, and labor movements— all occurring simultaneously but often fragmented. While political leaders' growing power and corruption showed a glimpse of liberation to the common people, it also endangered the lives of some marginalized tribal communities.

'Charanbhumi' portrays the peaceful 'goth' life on one hand, while on the other, it reveals emerging new problems. The novel chronologically traces unknown challenges, protests unethical oppression, and conflicting tensions. Through these conflicts, the lives of the shepherd communities evolve considerably.

Centered on 'goth' life, several other novels from the five decades following independence also explore similar themes. These include Samaresh Basu's 'Bathan' (1984), Saikat Rakshit's 'Harik' (1990), and Anil Ghorai's

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 712 - 721
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'Neel Dukkher Chhobi' (2001). Basu's novel narrates the life of the 'Gop' community, traditionally cow herders; Rakshit's work highlights occupational conflicts within the untouchable 'Hari' pig-rearing community; and Ghorai's novel depicts the 'Kakmara' community, pig herders in Tajpur, as dedicated preservers of their folk culture, seemingly untouched by contemporary developments.

Comparatively, 'Charanbhumi' stands out by vividly portraying 'goth'-life and the political scenario of the time, focusing on the daily struggles, internal conflicts, and survival tactics of the shepherd communities. This essay also investigates alternative solutions they seek to address their problems amid changing circumstances.

Discussion

স্বাধীনতা-উত্তর নব উদ্ভূত টালমাটাল পরিস্থিতির ব্যাখ্যান ভগীরথ মিশ্রের 'চারণভূমি' (১৯৯৪) উপন্যাসের কথাবস্তু। সময়টা লোকায়ত জীবনের নির্ভেজাল শান্তিপূর্ণ অবস্থানের কাল নয়। সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তন লোকালয়ের অদূরে অবস্থিত মানুষগুলোর মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। দীর্ঘদিনের জুলুম, অন্যায়, অত্যাচার সহ্য করার পর উনিশ শতকীয় শিক্ষার আলোকে প্রাপ্ত বোধ আধুনিক মানুষকে শক্তিশালী করে তুলছিল। অন্যদিকে গণতন্ত্রের প্রচার ও প্রসার, সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের জন্য তৎপরতার পাশাপাশি গজিয়ে উঠছিল অগণিত রাজনৈতিক দল। সরকারপক্ষ-বিরোধীপক্ষের জটিলতা থেকে গা বাঁচিয়ে থিতু হওয়ার সময় তখন অতিক্রান্ত। উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের ঝাপটা এসে লাগছে খোলামাঠে। নিজের অজান্তেই কোনো অদৃশ্য নিয়ামকের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে সাধারণ মানুষের জীবন। পরিবর্তনের এই প্রেক্ষাপটেই অনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর ধারাবাহিক গতিতে উপন্যাসের সমান্তরালে পুরুষানুক্রমে গর্জে উঠেছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সাধারণ জীবনের গ্রামীণ শান্তির পরিমণ্ডল এই উপন্যাসে অন্তর্হিত। বংশপরম্পরায় ভেড়া-চারোয়াদের কাজের গতিপ্রকৃতি প্রায় এক থাকলেও চিন্তনের ফাঁকফোকর গলে ঢুকে পড়েছে নতুন সমাজ। কার্যতই সামাজিক জীবন ও লোকজীবনের এক অনিন্দ্য সুন্দর মেলবন্ধন উপন্যাসটিতে উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

'গোঠ' শব্দের অপর একটি অর্থ বাথান। গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর যে সমস্ত পশুগুলিকে চরাতে হয় বা যেগুলি মাঠে ঘুরে ঘুরে ঘাস খায় তাদের চলাচলের ক্ষেত্রই এই 'গোঠ' বা বাথান। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বহু স্থানেই 'গোঠ' শব্দের উল্লেখ আছে। ব্রজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কতদিন আপনমনে ঘুরে বেড়িয়েছেন বৃন্দাবনের গোঠে-মাঠে। এই 'গোঠ' শব্দ থেকেই গ্রাম বাংলার ঘরে জন্ম নিয়েছে 'গোষ্ঠ' উৎসব। পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত গ্রামগুলিতে গৃহপালিত পশুদের পর্যাপ্ত পরিমাণ আহারাদির অভাব দেখা দিলে গ্রামের বেশ কিছু মানুষ দলগতভাবে পশুগুলিকে নিয়ে অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকায় (ডুয়ার্স অঞ্চল) নেমে আসে। সেখানে অনির্দিষ্টকাল থাকার স্বার্থে লতা, পাতা, বাঁশ, কাঠ দিয়ে অস্থায়ী ঘর তৈরি করে। ডুয়ার্স সংলগ্ন এলাকায় এই ঘরগুলিকেও 'গোঠ' বলে। ভুটান প্রদেশে ইয়াক পালনকারীরা এভাবেই অস্থায়ী আস্তানা গড়ে তুলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাড়ি জমায়। রবীন্দ্রনাথের গানে ("এই তো তোমার আলোকধেনু... আঁধার হল সাঁঝের সুরে/ ফিরিয়ে আনো আপন গোঠে"[১] কিংবা "নহ মাতা, নহ কন্যা... গোষ্ঠে যবে নামে সন্ধ্যা"[২]) কিংবা নজরুলগীতিতেও (যেমন "গোঠের রাখাল বলে দেরে কোথায় বৃন্দাবন"[৩]) 'গোঠ' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। আলিপুরদুয়ারের রায়মাটাং, সিকিমের জোংড়ি, অরুণাচল প্রদেশের দিরাং প্রভৃতি অঞ্চলে এমন অজস্র 'গোঠ' দেখতে পাওয়া যায়। এই আলোচনা থেকে 'গোঠ' শব্দের দুটি অর্থ স্পষ্ট। এক, 'গোঠ' কথার অর্থ গোচারণভূমি এবং দুই, এটি গোচারকদের নির্মিত অস্থায়ী গৃহ বিশেষ। দুটি অর্থ একটিই বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। আর তা হল চারণ। মোটকথা পশুচারণ। এখন প্রশ্ন হল কোন প্রেক্ষিতে লেখক উপন্যাসের নামকরণে 'চারণভূমি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মূলত সামগ্রিক পৃথিবীর চরাচরের অংশই চারণভূমি। আবার ভেড়াদের বিচরণের যে ক্ষেত্র তাও চারণভূমি। মানুষ যে-পথ ধরে হেঁটে হেঁটে চলে যায় তাও চারণভূমি। যে-পথে মানুষের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের সূত্রমালা গাঁথা তাও চারণভূমি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 712 - 721
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'চারণভূমি' উপন্যাসের সমান্তরালে বেশ কয়েকটি কাহিনির অবস্থান থাকলেও মূল কাহিনি অংশে ভেড়িহারদের জীবনযাত্রাই বর্ণিত। এখন প্রশ্ন হল এই ভেড়িহার কারা। ভেড়িয়ার তারা যারা ভেড়া চড়ায়। এই ভেড়াগুলি ভেড়া-চারোয়াদের নিজস্ব ভেড়া নয়। এই ভেড়াগুলি মালিকের ভেড়া। বিভিন্ন মালিকের কয়েক হাজার ভেড়া নিয়ে গঠিত হয় একটি 'গোঠ'। এতে এক একজন মালিকের এক একটি বাঘা থাকে। বাঘাগুলি মূলত ভেড়ার সংখ্যার ওপর নির্ভর করে। একজন মালিকের একাধিক 'গোঠ' থাকতে পারে। একটি দল সমস্ত ভেড়াগুলিকে নিয়ে বৃত্তাকারে চরাতে বের হয়। যাদের মধ্যে একজন 'ডেরোয়াহা' থাকে। সাধারণত এই ব্যক্তি হয় বয়োজ্যেষ্ঠ। এদের দূরদর্শিতা 'গোঠ'কে নানাভাবে পরিচালিত করে। তবে 'গোঠ' মূলত যার দায়িত্বে থাকে সে হল 'ম্যাড়াল'। 'ম্যাড়াল'ই 'গোঠ' কোথায় অবস্থান করবে, কীভাবে যাবে, কোন দিকে যাবে— এই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেয়। অবশ্য এই সিদ্ধান্তে দলেরও মত থাকে। এটি একটি দলগত কর্মসূচি। এক একটি গোঠের প্রত্যেকটি বাঘায় একটি করে 'ডেড়িয়াঅন' থাকে। এটি হল বুদ্ধিমতী বয়োজ্যেষ্ঠ একটি ভেড়া, যে দলের অভিমুখ পরিচালনা করে। সে হয় ভেড়াদের দলপতি। প্রতি বাঘায় দুজন 'বাগাল' থাকে। একজনের অসুস্থতায় অন্যজন কাজ চালিয়ে নেয়। অন্যান্য সময় দুইজন সম্মিলিত ভাবে কাজ করে। সাধারণত বর্ষাকালে 'গোঠ' থাকে পাহাড়ের উপর। ফসল বা ধান কাটার পর 'গোঠ' ধীরে ধীরে সমতলে নামতে থাকে। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে পাহাড়ের ঢালের বিভিন্ন টাঁড়-টিকরগুলিতে ফসল কাটা হয়। ডাঙা জমির ধান কাটা হয় কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহে। এরপর কাটা হয় কানালী জমির ধান। এবং সবশেষে পৌষমাসের প্রথম সপ্তাহে কাটা হয় গভীর অর্থাৎ শোল জমির ধান। এইসময় থেকেই গোঠের কাল শুরু হয়। 'গোঠ' নিচে নামে আশ্বিন মাসে। 'গোঠ'গুলি ফসলশূন্য জমিতে ডেরা জমায়। যার জন্য জমির মালিক ভেড়া-চারোয়াদের টাকা-পয়সা ও সিধেপাতি দিয়ে থাকে। ভেড়ার মলমূত্র হল উৎকৃষ্ট জৈবসার। এই সার যথোপযুক্ত পরিমাণে জমিতে প্রয়োগ করতে পারলে আগামী তিন বছর মাঠে দুর্দান্ত ফসল হয়। অন্য কোনো সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না। এই সুবিধা পেতে বিভিন্ন গ্রামগঞ্জ থেকে লোকজন এসে সিধেপাতি ও টাকাকড়ি দিয়ে বায়না করে যায়। কোনো গ্রামের কাছাকাছি 'গোঠ' পৌঁছালেই সেখানে খবর ছড়িয়ে পড়ে। উক্ত গ্রামের অবস্থাপন্ন জমির মালিকেরা কথা বলতে ছুটে আসে। পাকা কথা অনুযায়ী 'গোঠ' কোথাও সাতদিন, কোথাও দশদিন, আবার কোথাও এক পক্ষকাল অবস্থান করে। এছাড়াও সমতলে ভেড়া বিক্রি, ভেড়ার দুধ, দই, ঘি বিক্রি এবং লোম বিক্রির কাজও চলে। সমতলের ঘাস ভেড়ার সুখাদ্য, যা খেলে তার শরীর শক্তসমর্থ ও চিকনদার হয়। সহজেই ভেড়াগুলি অধিকমূল্যে বিকিয়েও যায়। বিভিন্ন খানদানি আদমির ক্ষেতে ডেরা পাততে পাততে 'গোঠ' এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘূর্ণায়মান পথে এগোতে থাকে। ঠিক বর্ষাকালে পাহাড়ের নিচে চলে যায়। বছর ঘোরে। এভাবেই চলে গোঠের দিনযাপন। চারণভূমিকে কেন্দ্র করেই এই 'গোঠ' জীবনের বারোমাস্যা।

উপন্যাসে যে 'গোঠ'টি নিয়ে আলোচনা সুবিস্তৃত হয়েছে সেই গোঠের 'ডেরোয়াহা' দাহো ভকত। প্রায় আশি বছর বয়সী বৃদ্ধ এই ব্যক্তি তার সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেছে গোঠে। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিয়মিত বিহার ও বাংলায় যাতায়াত করার ফলে এই এলাকার অন্তর্বর্তী কোনো কিছুই তার অজানা নয় –

> "এই পুরো ভূখণ্ডের কোন গাছে কোন ভূত থাকে, কোন দীঘিতে জ্যান্ত শেকল, কোন থানের কোন ঠাকুরের কি মাহাত্ম্য, কোন তাল গাছে বাজ পড়েছিল কোন সনে, কোন নদীর কোথায় ঘূর্ণি, কোথায় 'দ', সব, সবই তার নখদর্পণে।"[৪]

দীর্ঘ যাতায়াতের সূত্র ধরে জন্ম নিয়েছে অজস্র সম্পর্ক। বয়সের ভেদে দাহোকে কেউ মামা, কেউ জ্যাঠা আবার কেউ দাদু সম্বোধনে ডেকেছে। ইন্দাসের জামশোল গ্রামের মাতঙ্গিনী বুড়ি তাকে ধর্মপুত্র বানিয়েছে, তৈরি হয়েছে অজস্র বন্ধু-বান্ধব। কেউ গঙ্গাজল কেউ আমপাতা। এভাবেই গড়ে উঠেছে হাজারো সম্পর্কের ভিড়। তাদের কাছে বিপদে আপদে আত্মীয়ের মতো আশ্রয় পেয়েছে সে। তার হৃদয়ের ভালোবাসাটুকুও নিঙড়ে দিয়েছে সবাইকে। বছরের পর বছর সে এসেছে, গেছে। কালের নিয়মে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে অধিকাংশ স্বজন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ দাহো তাই অভিজ্ঞতার খনি –

> "দিনভর রাতভর ডেরা জেগে বসে থাকে, আর বাগালদের হরেক কিসিমের শলা দেয়, ভেড়াদের চাঙ্গা রাখবার উপায় বাতলায়, রোগে ওষুধ নির্ণয় করে দেয়, আর অবসর সময় বিড়বিড় করে বকতে থাকে

> কতকিছু, আপন মনে কথা কয় গাছের সঙ্গে, নদীর সঙ্গে, পাহাড়ের সঙ্গে, কখনো বা স্রেফ নিজের সঙ্গে। আজীব আদমি!"[৫]

এই দাহো ভকতের গোঠের ম্যাড়ালের নাম রামনা ভকত। সে দাহো ভকতের থেকে বয়সে খানিকটা ছোটো হলেও প্রকৃত ম্যাড়ালদের মতো বিচার-বুদ্ধিতে পোক্ত নয়। তার ভালো মানুষির সুযোগে অনেক সময় বহু সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় বাগালেরা। তারও অভিজ্ঞতার দাম আছে। মনে মনে বাগালেরা প্রতিবাদ জানালেও তারা জানে গোঠের আমদানি রপ্তানির কাজে রমনা ভকত সুদক্ষ না হলেও তার অভিজ্ঞতা এবং বিচক্ষণতার জোরে বহুবার 'গোঠ' চোর-ডাকাত, উটকো ঝামেলা কিংবা জটিল পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। ম্যাড়াল যেন 'গোঠ' পরিবারের কর্তা। ফলে বাগালদের সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি তাকে লক্ষ রাখতে হয় ভেড়াদের সুযোগ-সুবিধাও। এমন পথে 'গোঠ'কে পরিচালনা করতে হয় যে পথে ভেড়ার প্রিয় খাদ্য চকোড় এবং শিয়ারপোকার অঢেল ঝোপ ঝাড় আছে। সব মিলিয়েই তারা রামনা ভকতের প্রভুত্ব মেনে নিয়েছে। দাহো ভকতের 'গোঠ'টিতে মোট সাতটি বাঘা আছে। তার মধ্যে একটি বাঘা বিশ্বনাথ ভকতের, দুটি দুটি করে বাঘা আছে মাণিক্য ভকত, শ্রীকৃষ্ণ ভকত এবং যদু ভকতের। এই উপন্যাসের মূল চরিত্রে আছে শ্রীকৃষ্ণ ভকতের বাঘার অন্যতম বাগাল মুনসী। তার সমগ্র পরিবারের প্রত্যেকেই উপন্যাস আলোচনায় এবং উপন্যাসের পটপরিবর্তনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছে। সাতটি বাঘায় মোট ভেড়ার সংখ্যা দেড় হাজার। একটি হাতের পাঁচটি আঙুল নিয়েই যেমন সামগ্রিক সৃষ্টি, তেমনই এই গোঠের প্রতিটি মানুষেরই বিভিন্ন মানসিকতা একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠে একটি 'গোঠ' জীবনের সামগ্রিক আলোচনাকে পরিপুষ্টি দান করেছে।

ভেড়িহারদের জীবনে সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার পরিবর্তে বিপদই বেশি। ওরা বহিরাগত। একস্থানে কখনোই থিতু হয় না। যে স্থানেই যাক না কেন পরিচিত কেউ নয়। এমতাবস্থায় খোলা আকাশের নিচে, রোদ-ঝড়-জল-বৃষ্টিতে পচে, লোকালয় থেকে দূরে, বড়ো কোনো নদীর ধার বা পুকুরের পাড়ের বিস্তৃত ক্ষেত জমিতে ওরা ভেড়ার পাল রেখে আস্তানা গাড়ে। নোংরা তেলচিটে কম্বল ক'খানি সম্বল করে ঘুরে বেড়ায়। সেই জীবনে জোতদার, মজুতদার, আড়তদারদের পাশাপাশি আছে চোর-ডাকাতের ভয়। এরা সামান্য মেষপালক, লাঠিয়াল নয়। যুদ্ধ জানে না। ওরা ভীতু এবং নিরীহ। তাই বিপদ এলেই দল ছেড়ে পালায়।

প্রতি পদক্ষেপ ভাবনা-চিন্তা করে ফেলতে হয়। পান থেকে চুন খসলেই বিপদ। বিবরদায় অবস্থানকালীন এই দল এমনই একটা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। সব ঘটনার যেমন পূর্বসূত্র থাকে তেমন এই ঘটনারও সূত্রপাত হয়েছিল মানিকমারা গ্রামে। সেখানে সপ্তাহাধিক সময় থাকলেও মনে সুখ ছিল না কোনো বাগালের। বাগালদের ভালো থাকাটা অনেকটা নির্ভর করে জমির মালিকের ওপর। যার জমির ওপর তারা অবস্থান করবে সেই জমির মালিক তাদের টাকা, পয়সা বকশিস দেবে। ভালো সিধেপাতি দেবে। তবেই না তারা খুশিতে অবস্থান করবে! অথচ এই পৃথিবীতে নানা জাতের লোক বাস করে। কেউ দয়ালু মনের তো কেউ কঠোর, কেউ লোভী তো কেউ নিষ্ঠুর। কিন্তু সবাই এই পৃথিবীরই মানুষ। কাজও সবারই হয়। কারোর কাজ বন্দুকের নলের সাহায্যে হয়, কারোর কাজ হয় শুধুমাত্র মুখের কথায়, কোথাও আবার মুখ থেকে কথাটি ফোটার আগেই কাজ হয়ে যায়। কিন্তু মানিকমারা গ্রামের লোকেরা সহজ সরল বা ভালো প্রকৃতির একেবারেই বিপরীত। পাটোয়ার সূর্যকান্ত মহান্তির অনেক বড়ো কারবার। সে অত্যন্ত কঞ্জুস। অপরদিকে মানিকমারা গ্রামের প্রতিটা লোকই দুর্ধর্ষ। আরও দু চারটে গৃহস্থদের মাঠেও কয়েকদিন করে থাকার কথা। ফলে পালাবার উপায় নেই। তাছাড়াও ভেড়া-চারোয়াদের দীর্ঘদিন যাতায়াতের সূত্রে পথের একটা রূপরেখা থাকলেও ওরা মূলত সেইসব গ্রামে ডেরা পাতে যারা ওদেরকে ডাকে। এই পদ্ধতিটা খানিকটা চেন সিস্টেমে হয়। মোহান্তিরা গ্রামের সমৃদ্ধশালী বড়লোক। তাদের সাথে বা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কিংবা অভিযোগ সোনার পাথরবাটি। সমস্ত সিধেপাতি বা বকশিস সংক্রান্ত কথোপকথন সম্পূর্ণ মৌখিক ভাবে হয়। কেউ না মানলে উক্ত পরিস্থিতি মেনে নেওয়া ছাড়া জোর করে মানাবার কোনো পথ নেই। এদিকে ভেড়া-চারোয়ারা জানে বছরের পর বছর তাদের একই পথে আসতে হবে। এমন কোনো কাজই তারা করতে পারে না যা তাদের ভবিষ্যতে ওই নির্দিষ্ট গ্রামে বা ওই নির্দিষ্ট পথে আসার পথটিকে সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করে দেয়। সবদিক বিচার-বিবেচনা করে তারা পালিয়ে যাওয়ার জন্য মিটিং বসায়।

এই মিটিংএর মধ্যেও দুটি দল তৈরি হয়। একদল শান্তিপ্রিয়, বিচক্ষণ। তারা জানে, যে মানুষের হাতের মুঠোয় পঞ্চায়েত তার কাছে কিছুই অসাধ্য নয়। সাধারণত এই 'গোঠ'গুলি নদীর বা জলাশয়ের ধারে গ্রামের একেবারে প্রান্তে অবস্থান করলেও ভেড়া-চারোয়াদের ভালো-মন্দ-লাভ-ক্ষতির ভার উক্ত গ্রামবাসীদের ওপরেই ন্যস্ত থাকে। অন্যদল জানায় মানিকমারা গ্রামে সূর্যকান্ত মোহান্তির মতই বিবরদায় রামপদ মুখার্জি আছে। সেও দুর্ধর্ষ ব্যক্তি। অথচ দরিদ্রের প্রতি তাঁর দয়া-মায়া অসীম। শেষপর্যন্ত সেই আশাতেই বুক বাঁধে 'গোঠ'। পালিয়ে যাওয়া সহজ কথা নয়। চুরি ডাকাতি করে পালিয়ে যাওয়া বরং সহজ, কিন্তু চোখের সামনে দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে অগণিত ভেড়ার পাল নিয়ে পালানো নেহাতই কঠিন –

> "ঠিক হয়, কাল সকালে সবাই যে-যার মতো বাঘা নিয়ে রওনা দেবে, যেন দৈনন্দিন রুটিনমাফিক ভেড়া চরাতে চলেছে। কিন্তু সক্কলের হাতে হাতে নিয়ে নেবে দু-চারটি করে তৈজসপত্র, কম্বল, পোষাক-আশাক, আর গাভারগুলিকে তুলে নেবে কোলে। মাঠের মধ্যে, ফাঁকা ডেরায়, কেবল পড়ে রইবে দাহো ভকত আর কুকুরগুলি। ঠায় দুপুরে, প্রতিটি বাঘার থেকে একজন করে ফিরে আসবে ডেরায়। হাতাহাতি করে তুলে নেবে বাকি সামগ্রী। তারপর, সবার অলক্ষ্যে, পৃথক পৃথকভাবে স্থান ত্যাগ করবে সবাই। সন্ধ্যের আগে গিয়ে যে-যার বাঘাসহ হাজির হবে বিবরদার মাঠে। রাতের বেলায় হয়ত বুঝতে পারবে না কেউই, সকাল বেলায় মানিকমারা গাঁয়ের মানুষ আচানক আবিষ্কার করবে, তাদের ক্ষেত খাঁ-খাঁ করছে, সারা গাঁয়ের মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে পাখি ভাগলবা।"[৬]

ভাবনার রেখা ধরে সরলে ভেড়া-চারোয়াদের জীবন চলে না। তারা ভাবে এক, হয় আর এক। দেওয়ালেরও কান আছে। খোলা আকাশের নিচে কথা হাওয়ার আগেই কথা শনশন করে ছোটে। যদিও গোঠের বিপদ এসেছে অন্যপথে। মানুষের ভাবনা চিন্তায় একটা নির্নিমেষ সীমাবদ্ধতা আছে। যেটা মানুষকে তার অবস্থান, পরিবেশ, পরিচিতির বাইরে বেরিয়ে ভাবতে বিশেষ সহায়তা করে না। সুতরাং বিপদ কোনদিক থেকে কীভাবে আসতে পারে তাও মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ানো মানুষগুলোর ভাবনার অতীত। মোহান্তি রামনা ভকতকে ডেকে পাঠানোর খবরে বাকি ভেড়া-চারোয়াদের হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় উদগ্রীব হয়ে ওঠে বিপদের আশঙ্কায়। তাদের মনে অন্যায়ের বোধ থাকায় একে অপরকে দোষারোপ করে। অনুমান করে তাদেরই কেউ গোপনে খবর দিয়েছে সূর্যকান্ত মোহান্তিকে।

লখীন্দরের লোহার বাসরে ছিদ্র থেকে যায় আর এ তো খোলা মাঠের আলোচনা। তারা নানা রকম দুর্লক্ষণ দেখতে পায়, চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তাদের শেখায়নি বিপদ অন্যদিক থেকেও আসতে পারে। এমন কোনো কারণও সৃষ্টি হতে পারে যা তাদের একেবারেই অজানা। তারা মাঠে, ঘাটে ঘোরে। আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে কী কাজ! তারা জানতে পারে না সমাজের আনাচে কানাচে ভোটের ডঙ্কা বেজে উঠেছে। সূর্যকান্ত মোহান্তি ম্যাড়ালকে জানায় বাঁকুড়া শহর থেকে নেতারা আসছে ভোটের মিটিং করার উদ্দেশ্যে। সেই সভায় জমজমাট খাওয়া-দাওয়া হবে। যার জন্য প্রয়োজন দুটি পূর্ণবয়স্ক ভেড়া। যে ভেড়া দুটির দাম ন্যূনতম দুই হাজার টাকা। সেই ভেড়া দুটি বিনামূল্যে তুলে দিতে হবে অন্যদের মৌজমস্তির জন্য। ঝামেলায় পড়ে যায় বাগালেরা। এই ভেড়াগুলির কোনোটাই তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। মালিক মূল গ্রামে বাস করে। আর বাগালেরা ভেড়াগুলি চরায় মাত্র। এছাড়া ভেড়ার ওপর আর কোনোই অধিকার নেই। সেই ভেড়া, তাও আবার এতো দামি ভেড়া, শুধুমাত্র মানিকমারা গাঁয়ে থাকার অপরাধে দিয়ে দিতে হবে। এ এক সাংঘাতিক জুলুম। গ্রামঘরে যে ধরনের জোরজুলুম দেখা যায় এ তার থেকে খানিকটা ভিন্ন। গোঠের লোকেরা ভিনদেশি। তারা মানিয়ে গুছিয়ে চলতেই পছন্দ করে। সেই সুযোগকে কাজে লাগায় গ্রামের পাটোয়ারী কিংবা বড়োলোকেরা। তারা জানে নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের প্রয়োজনেই ভেড়া-চারোয়ারা তাদের অন্যায় দাবি মেনে নেবে। দুর্বল বলেই যথোপযুক্ত সিধেপাতি, টাকা পয়সা না দিয়েও অনায়াসে জুলুম করা যায় এদের ওপর। কিন্তু এই জলুমবাজির ফলাফলে উলটো প্রতিক্রিয়া হয় বাগালদের। যে কজন তখনও সংশয়াচ্ছন্ন ছিল তারাও সিদ্ধান্ত নেয় চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সকলেই জিনিসপত্র নিয়ে রওনা দেয় অজানার উদ্দেশ্যে। দুই দিন পর তারা গন্তব্যে পৌঁছায় –

> "পরশু সকালে মানিকমারা থেকে প্রায় নিঃশব্দে রওনা দিয়েছিল ওরা। সাতটি বাঘা আলাদাভাবে যাত্রা শুরু করেছিল বিবরদার উদ্দেশে। প্রত্যেকেই ভাগাভাগি করে নিয়েছিল ডেরার যাবতীয় সামগ্রী। দুপুর

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 712 - 721
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> নাগাদ রামনা ভকত গিয়ে দাহো ভকত এবং ডেরার অবশিষ্ট সামান্য জিনিষপত্তরগুলিকে নিয়ে চলে এসেছিল। দিনভর চরতে চরতে তালডাংরা বাজারকে অনেকখানি তফাতে রেখে, ভেড়াগুলো সারাদিন হেঁটেছে। কিন্তু বিবরদা পৌঁছুবার আগেই ঘনিয়ে এল আঁধার। বাধ্য হয়ে ওরা রাত কাটাল জয়পণ্ডা নদীর গা ঘেঁসে কুসমী গাঁয়ের মাঠে। কাল ভোর ভোর রওনা হয়ে সন্ধ্যে নাগাদ পুরো 'গোঠ' পৌঁছেছে বিবরদার মাঠে।"[৭]

আলোচনা হচ্ছিল বিপদ নিয়ে। বিপদ ছায়ার মতোই তাদের সঙ্গী হয়েছিল মানিকারা গ্রাম থেকে। ঘূণাক্ষরে কিছুই টের পাওয়া যায়নি। বিবরদার সম্পদশালী মানুষ রামপদ মুখুজ্জের নেতৃত্বে তিন চারজন সম্পন্ন মানুষ এসে গোঠের সাথে পাকা কথা বলে গেছে। সিধেপাতি পাঠিয়ে দিয়েছে সন্ধ্যেবেলাতেই। 'গোঠ'টির অবস্থান হয়েছে মূল গ্রাম থেকে বেশ খানিকটা দূরে। জয়পণ্ডা নদীর নিকটবর্তী। এর উত্তরদিক জুড়ে বৃহৎ শালের জঙ্গল। আগামী দশদিনের নিশ্চিত অবস্থানের মাঝেই বিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে। খেদাড়েং ভকত আগেই এসে খবর দিয়েছিল কিছু লোক লাঠিসোটা হাতে নিয়ে গোঠের দিকে আসছে। কাছে আসতেই বোঝা যায় তারা মানিকমারা গ্রামের লোক। সূর্যকান্ত মহান্তির পুত্র শঙ্কর মহান্তি এবং তাদেরই বাখুলের পাঁচ সাতজন মজুর! কেউ হাতে মারে তো কেউ বেঁধে। এদের প্রবণতাটাই হল বেঁধে মারার। এসেই তারা ঘিরে ফেলেছে বাগালদের। এরপর আদেশ করেছে মানিকমারার দিকে গোঠের মুখ ঘোরাতে। অন্যগাঁয়ের থেকে নিজের গাঁয়ে লুটপাট ভালো হয়। সেখানে দশটা ভেড়া হাসতে হাসতে কেড়ে নেওয়া যায়। উত্তপ্ত বাকবিতন্ডায় নাছোড় শঙ্কর মহান্তি উপায়ন্তর না দেখে ভালো ভালো দশ-বারোটা ভেড়া বেছে নেওয়ার হুকুম দেয়। কুকুরদের চিৎকার, ভয় সব কিছু উপেক্ষা করে চলে প্রকাশ্য লুণ্ঠনের কাজ। একসময় শেষ রক্ষা হয়। গ্রামবাসী খবর পেয়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে তেড়ে আসে। বিপদ বুঝে সুযোগ মত পালিয়ে যায় মানিকমারা গাঁয়ের লোক। এভাবে একটা বিপদ এড়ানো যায়। হাজারো বিপদ নয়। ভাগ্য কখনোই গল্পের মতন সুপ্রসন্ন হয় না বাগালদের।

এই ধরনের বিপদগুলি ছাড়াও আছে কিছু প্রাকৃতিক বিপদ। বিষাক্ত পোকামাকড় কিংবা কীটপতঙ্গ, সাপের মতো মৃত্যুবাণের সাথে সহবাস। তবে সেগুলির সঙ্গে দৈনন্দিন বসবাসের ফলে বাগালরা জানে মাঠের কোথায় সাপ থাকে, কোথায় ইঁদুর। তারা জানে বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড়ে সৃষ্ট ক্ষত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক লতা-পাতা। বাগাল জীবনে আরও এক ধরনের বিপদ আছে। যার মূলে আছে চোর ডাকাত। আপাতভাবে বাগালদের কাছে কোনো অর্থবল নেই, মনে হলেও আসলে ব্যাপারটি কিন্তু সে রকম নয়। সাধারণত ভেড়া বা ভেড়ার লোমের লেনদেন মালিকের বাড়িতে হয়। কিন্তু কখনও কখনও পাইকাররা মাঠেও টাকাপয়সার লেনদেন করে থাকে। তখন অনেকগুলি কাঁচা টাকা গোঠেই থাকে। যদিও এই টাকার ওপর বাগালদের কোনো অধিকার থাকে না। সবই মালিকের টাকা। মালিকের হাতেই তুলে দিতে হয়। বাগালরা শুধুমাত্র সেই টাকাগুলির রক্ষক। অন্যের অর্থের দায় আরও বেশি। কাঁচা টাকার গন্ধ আকাশে বাতাসে ওড়ে। এখানেও তাই হয়েছে। সেই লেনদেনের খবর চলে গেছে ডাকাতদের কানে। বিন্দুমাত্র সময় না দিয়ে লেনদেনের রাত্রেই হানা দিয়েছে ডাকাতের দল। দলের টাকা পয়সা থাকে দাহো ভকতের কাছে। সে বৃদ্ধ এবং বয়সের ভারে ন্যুব্জ, অথর্ব। গভীর রাতে ঘুমে অচেতন অবস্থায় ডাকাতের শোরগোলে বাকিরা প্রাণ বাঁচিয়ে পালাতে পারলেও সে পালাতে পারেনি। ডাকাতরা তাকেই ঘিরে ধরেছে। জনা দশেক ডাকাতের হাত থেকে বাঁচার কোনো আশাই থাকার কথা নয়। জলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেও বিপদ অনেক সময় মানুষকে প্রতিবাদী করে তোলে। তাই হয়তো মরিয়া হয়ে উঠেছে মুনসী ভকত। মানবিকতা বোধ তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে একাই ডাকাতদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। যে সমস্ত বাগালরা নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে গেছিল তারা দূর থেকে অনুমান করে কিছু একটা হচ্ছে। কী হচ্ছে সেটা বুঝে উঠতে পারে না। তবে গোঠের গোলমাল এবং চিৎকারে গ্রামবাসীরা জেগে উঠে লাঠিসোঁটা নিয়ে তেড়ে এলে ডাকাতেরা পালায়। রক্ষা পায় বাগালদের প্রাণ ও লেনদেনের ক্ষেত্র থেকে আমদানি করা অর্থ। প্রাণ বাঁচলেও এ দৃশ্য গল্পের মতো নয়, একান্ত বাস্তব। ফলে আঘাতের ফলাফল স্বরূপ প্রত্যাঘাতও এসেছে মুনসীর ওপর। মাথা ফেটে রক্তাক্ত হয়েছে।

মাঠচরা মানুষেরা অধিকাংশই বাধ্য হয়ে এই কাজে নামে। কাজ করতে করতে নেশায় পড়ে যায়। এই নেশা কাজের নেশা। মাঠের নেশা। বাদবাকি এই জীবনে কিছুই নেই। না তারা সংসার করতে পারে, না সংসারে থাকতে পারে।

বছরের পর বছর পরিবার পড়ে থাকে প্রবাসে। চলাচলই সার। দিনের শেষে হাত শূন্য। সেভাবে রোজগার কিছুই হয় না। অথচ জীবন-নদী বয়ে যায়। তাই যাদের উপায় থাকে, কর্মক্ষমতা থাকে তারা ভেড়া-চারোয়া হয় না। যদিও ভেড়া চরানো ভকতদের জাতপেশা, তবুও তারা এই পেশাকে দূরে সরিয়ে চলে যায় অন্য কাজে। যে কাজে অন্তত খানিকটা অর্থ হাতে আসবে, আসবে স্বচ্ছলতা। স্বাধীনতা-উত্তর জীবনে দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে সবকিছুর। আগুন বাজারের পাশাপাশি বড়োলোকেদের নানা রকম জোরজুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ ভিটে-মাটি ছেড়ে চলে যাচ্ছিল অন্যত্র। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রয়োজনই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। শহরের রঙিন হাতছানি মাঠ জীবনের ক্লান্তিকর একঘেয়েমিতে বিরক্তি এনে দেয়। আধুনিক জীবনকে উপভোগ করার কোনো রসদ এখানে নেই।

স্বাধীনতা-পরবর্তী লোকজীবন নানারকম পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্যে দিয়ে পা রেখেছে নতুন যুগের ভোরে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে না চলতে পারলে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হতে হবে। এ বোধ ভেড়িহারদের আছে। তবু তারা মানতে চায় না কাজের নেশায়। বিশেষত বৃদ্ধরা। কিন্তু যারা জোয়ান তাদের মধ্যে বোকা এবং ঋণগ্রস্তদের উপায় নেই। তারা গোঠের কাজ মুখ বুজে করে যায়। কিন্তু যাদের মোটের ওপর দু'কলম বিদ্যে বুদ্ধি আছে তারা সুযোগ খুঁজে পালিয়ে যায়। কোনো মূল্যবোধের দোহাই দিয়েও তাদের আটকে রাখা যায় না। দাহো ভকতও আটকে রাখতে পারেনি লোটন ভকতকে। পিতার মৃত্যুকামনার ছবি, রাগ, দুঃখ, অভিমান কোনোটাই টলাতে পারেনি লোটনকে। সে গোঠে শেষ দিন পর্যন্ত অন্যায় জীবন যাপন করেছে। অতঃপর রাতের অন্ধকারে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে গেছে। পালিয়ে যাওয়াটা অবশ্য তার জন্য ভালোই হয়েছে। 'গোঠ'-জীবন থেকে তার মুক্তি মিলেছে। আকাশে বাতাসে অর্থ উড়ে বেড়ালেও কাজ পাওয়া মুখের কথা নয়। সেই পদ্ধতি জানতে হবে। রাস্তা জানা থাকলে টাকা আসবে নইলে নয়। এক্ষেত্রে লোটন তার সৎ দাদা বাঁকেলালের প্রস্তাব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। বাঁকেলালের শরীরে শহুরে পোষাক, বাহারি নাগরা জুতো, গায়ে মিষ্টি এসেন্সের গন্ধ। হাতে অজস্র টাকা। যা দিয়ে যেমনটি মন চায় তেমনটি খাওয়া যায়। সিনেমা দেখা যায়। নীলছবি দেখা যায়। নানা জাতের মদ খাওয়া যায়। যৌবনের রঙিন স্বপ্ন দেখায় বাঁকেলাল। 'গোঠ' জীবনের কষ্ট অজানা নয় লোটনের। শীত-গ্রীষ্ম, বর্ষায় ভেড়া গোঠের পিছনে ছুটে ছুটে সাধের যৌবন নষ্ট হয়। একমুঠো ভাতের জন্য ফেরি করে বেড়াতে হয় গ্রাম থেকে গ্রামে। অথচ পিতার ইচ্ছাপূরণ করতে তাকে জোর করে গোঠে যেতে হয়েছিল। যৌবনের যে নেশা একবার ধরে গেছে তাকে কি এতো সহজে ছাড়া যায়! ফলে 'গোঠ' যেখানেই গেছে সেখানেই সে খুঁজেছে নারীসঙ্গ। বিষ্টুপুর থানার রামসাগরের মাঠে 'গোঠ' থিতু হলে বিড়াই নদীর দিকে রাধা নামক একটি মেয়েকে মিথ্যে কথার ছল-চাতুরিতে বশ করে ফেলেছে লোটন। মধুর ফাঁদ বড়ো সাংঘাতিক। তার থেকেও বড়ো ফাঁদ আস্ত মৌচাকের লোভ। এই লোভের ফাঁদে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বিবরদা গ্রামে লোহার পাড়ার মেয়ে হাঁসলির সাথে আকাম কুকামের কথা জানতে পেরে গেছে গ্রামের লোক। লোহাররা সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিচার হবে ভেড়িয়াদের। নাটমন্দিরে পিছমোড়া করে বাঁধা হবে লোটনকে। মোটা জরিমানা করা হবে, যার অর্থ দু-চারটে দামী ভেড়া বিনি পয়সায় দিয়ে দেওয়া। এই খবর শুনেই লোটনকে 'গোঠ' পাঠিয়ে দিয়েছে বাঁকুড়া শহরে। নিজেরাও রওনা দিয়েছে নতুন পথে। তুলনামূলকভাবে লোটনের শাপে বরই হয়েছে। সে এই ভেড়িয়াদের জীবন থেকে মুক্তি চেয়েছিল। মুক্তি এসেছে অবিশ্বাস্য পন্থায়। যুগ পরিবর্তনের চিহ্ন এই উপন্যাসের অধিকাংশ মানুষের চিন্তনে স্পষ্ট। যে চিন্তনের বশবর্তী হয়ে লোটন রাঁচী চলে গেছে। এই অংশে মুনসী ভকতের মনে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ ভকতের মেয়ে দুর্গার পাত্তা না পাওয়ায় লোটনের চলে যাওয়ার পিছনে অন্যতম কারণ। লোটনের মাও ছেলেকে ঘিরে হাজারো স্বপ্ন দেখেছে। সে সব কথা একান্তই অবাস্তব –

> "বুড়াটাকে টুকচান দেখো তুমরা পাঁচজনায়। এই বইসে গোঠের কাজকর্ম কি সয় উয়ার শরীলে! লোটনটা টুকচান লায়েক হইলে, আর ভাবনা নাই। ত্যাখন সনসার সামলাব্যেক উ, বুড়া-বুড়ির ত্যাখন ছুটি।"[৮]

বাস্তব মুনসীকে বুঝিয়েছে লোটন আর ফিরবে না কোনোদিনই। মা-বাবার স্বপ্ন চিরদিনের জন্য মিথ্যে করে দিয়ে এক অজানা সুখ-স্বর্গে চলে গেছে লোটন।

দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে তবেই মানুষ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অত্যাচার ও জুলুমবাজির প্রতিবাদ করে। মানুষ স্বভাবতই অলস। যতক্ষণ না তার নিজের ঘর ভাঙছে সে কিছুতেই তার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না। যখন নিজের ঘর ভাঙে তখনও পরিবার পরিজনদের কথা ভেবে চুপ করে থাকে। তবে তার মধ্যে কেউ কেউ সব-হারানোর জেদ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 84
Website: https://tirj.org.in, Page No. 712 - 721
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিয়ে জন্মায়। যাদের রক্তে আছে প্রতিবাদের স্রোত তারা প্রতিবাদ করে। মরে। কিন্তু পিছনে তৈরি করে দিয়ে যায় আরও কিছু প্রতিবাদী। আধুনিক যুগে প্রতিবাদ যেমন বদলেছে, তেমনই বদলেছে প্রতিবাদী। উভয়েই উভয়ের পন্থা পরিবর্তন করেছে যুগের সাপেক্ষে। কেবল অত্যাচারের ধরন বদলেছে, বিনষ্ট হয়নি। অত্যাচারিত বুঝেছে সংঘবদ্ধ লড়াই প্রকৃত বিপ্লব ঘটাতে পারে। শিক্ষার আলো না থাকায় দীর্ঘদিন যে মনোভাব মাটির কবরে শায়িত ছিল, স্বাধীনতা ও দুই বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বায়নের প্রভাবে পদদলিতের প্রতি নিশ্বাসে তা ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। আগে মানুষ জানত যারা দলিত তারা অচ্ছ্যুৎ। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রভাব ও কিছু সহৃদয় ব্যক্তির সহায়তা তাদের বুঝিয়েছে বিষয়টা ছুৎ-অচ্ছুৎ-এর নয়। তারা মানুষ এটাই একমাত্র পরিচয় হওয়া উচিত। আবার একটা খোলস ভেঙেছে। শামুকের শক্ত খোলসের একটি একটি পরত ভাঙার এইটি শেষ ধাপ। যার পরে প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছু পড়ে থাকে না। এই লড়াই অধিকার অর্জনের— যা লড়েছে উপন্যাসের রূপলাল।

'গোঠ' জীবন নিয়ে যে কতিপয় উপন্যাস লেখা হয়েছে তার মধ্যে সমরেশ বসুর 'বাথান' (১৯৮৪), সৈকত রক্ষিতের 'হাড়িক' (১৯৯০), ভগীরথ মিশ্রের 'চারণভূমি' (১৯৯৪), অনিল ঘড়াইয়ের 'নীল দুঃখের ছবি' (২০০১) অন্যতম। 'বাথান' উপন্যাসে গোপ সম্প্রদায়ের জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। বছরের অর্ধেকটা সময় দিসারার গোপ সম্প্রদায়ের বেশ কিছু মানুষ গো-ধন নিয়ে নদিয়া থেকে বর্ধমান, নিমদহ থেকে রূপদহের মাঠে মাঠে ঘুরতে থাকে। গরুর দুধ বিক্রি করে, বিনিময় প্রথায় বলদের পরিবর্তে শস্য সংগ্রহ করে। উন্মুক্ত আকাশের নিচে আশ্চর্য জীবনের বাঁকে অজস্র বিপদের সম্মুখীন হয়। কখনো রাত জেগে অসুস্থ পশুদের সেবা করে, কখনো মড়ক লেগে অনেকগুলি গো-ধন মারা যায়। ভুলবশত অন্যের জমিতে গো-ধন ঢুকে গেলে অনাবশ্যক ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এই অনিশ্চিত জীবন থেকে পরবর্তী প্রজন্ম মুক্তি চায়। অনিশ্চিত জাতপেশা থেকে সরে গিয়ে খুঁজে নিতে চায় শান্তিপূর্ণ ডাল-ভাতের আশ্রয়। দুধ থেকে ছানা তৈরি করে মিষ্টি বানানোর কাজকে গোপেরা অত্যন্ত ঘৃণা করে। সময়ের পরিহাসে একসময় সেই কাজকেই কেউ কেউ পেশা হিসাবে গ্রহণও করে নেয়। লেখক সোমনাথ ভট্টাচার্যের আগ্রহেই সমরেশ বসু মদনপুরে গিয়ে 'বাথান' সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হন।[৯] সৈকত রক্ষিতের 'হাড়িক' উপন্যাসে পেশাগত দ্বন্দ্ব আরও সুস্পষ্ট। পুরুলিয়ার মানবাজার এলাকার অদূরেই হাড়িপাড়ার অবস্থান। বারো-তেরো ঘর 'হাড়ি' সম্প্রদায়ের মানুষ এই পাড়ায় অবস্থান করে। এরা অস্পৃশ্য, বঞ্চিত, প্রান্তিক মানুষ। এদের কল্যাণে কিছু নেতা সদর্থক ভূমিকা নিলেও অনতিবিলম্বে দুর্নীতিগ্রস্ত দলীয় কর্মচারীদের হস্তক্ষেপে হাড়িরা চিরবঞ্চিতই থেকে যায়। এককালে হাড়িরা রাজার আস্তাবলে সহিসের কাজে নিযুক্ত ছিল। অতীত গৌরবকে বুকে আগলে আজ এরা কেবলই শূকর-পালক। মানবাজারের পয়সাওয়ালা লোকেদের ক্রয় করা শূকরগুলিকে চরানোই এদের কাজ। আর্থিক সংস্থান এদের প্রায় নেই বললেই চলে। শূকর প্রতিপালনের পাশাপাশি দিনমজুরিই ভরসা। সেই কাজও ক্রমশ অপ্রতুল। বাথানের লোকেদের মতো এরাও পশুপালন করতে গিয়ে নানারকম বিপদের শিকার হয়। পশুদের দ্বারা অন্যের জমিতে ক্ষতি হলে সরকারকে জরিমানা দিয়ে বন্দি পশুকে ছাড়িয়ে আনতে হয়। গোপ সম্প্রদায়ের তুলনায় হাড়িরা শিক্ষা বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন। তারা অনেক ঠেকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতন হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের খেলার পুতুল হয়ে তাদের দুর্বিষহ গোষ্ঠী জীবনের বর্ণনা হাজির করেছেন সৈকত রক্ষিত। সমালোচকের মতে –

"গোষ্ঠীর যে জীবন-সমাচার তাঁর উপন্যাসে, তা একদিক দিয়ে জীবিকা-সমাচার।"[১০]

এমনি একটি শূকর পালনকারী জাতি কাকমারা। 'নীল দুঃখের ছবি' উপন্যাসে তাজপুরের কাকমারা সম্প্রদায়ের কথা লিখেছেন অনিল ঘড়াই। এরাও অচ্ছুৎ ঘৃণ্য জাতি। অন্ত্যজ সমাজের প্রতিনিধি। কাকমারারা শূকর পালনকারী একটি ভ্রাম্যমান দল। কাকের মাংস এদের প্রিয় খাদ্য। সেই থেকেই এই জনগোষ্ঠীর নাম কাকমারা। এরা এক জায়গায় থিতু হতে পারে না। এদের নিয়তি, দীর্ঘ সময়ের পরিসরে গঠিত মন-মানসিকতা থিতু হতে দেয় না। এদের দেখে মনে হয় পশুদের সাথে ঘুরতে ঘুরতে এরাও পশুতে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিনের যাত্রাপথের হাজারো ক্লান্তি ঝড়ঝাপটার ছাপ ফুটে উঠেছে জীর্ণ-শীর্ণ শরীরে। কাকমারাদের জীবনে একমাত্র বিলাসিতা গরম এক থালা মোটা লাল চালের রাঁধা ভাত। আলুসিদ্ধ আর খেসারির ডাল। পোড়া শুঁটকি মাছের গন্ধ এদের কাছে অমৃত। এরা জানে দাঁড়িয়ে যাওয়া মানেই মৃত্যু, চলার নামই জীবন। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় গ্রামীণ জনবসতি থেকে কিছুটা দূরে যত্রতত্র অস্থায়ী তাঁবু খাটিয়ে কাকমারারা থেকে যায় অনির্দিষ্টকাল। অজানা অচেনা উটকো লোকের উপদ্রব গ্রামবাসীরা কখনোই পছন্দ করে না। তারা কাকমারাদেরকেও চোর

সন্দেহ করে পিটিয়ে মারে। অবিশ্বাসের চোখে দেখে। তাদের কর্মজীবনের মতো ব্যক্তিজীবনও রক্তাক্ত। যদিও বাকি উপন্যাসগুলির মতো তৎকালীন রাজনৈতিক পরিমণ্ডল নিয়ে আলোচনায় তীব্র নিরুৎসাহ লক্ষ করা যায় অনিল ঘড়াইয়ের উপন্যাসে। তুলনায় এই উপন্যাসে লোকায়ত জীবনের ধারাপাত লক্ষণীয়। 'গোঠ'-জীবন সম্পর্কে উপরিউক্ত আলোচনার সাপেক্ষে 'চারণভূমি' উপন্যাসে 'গোঠ' জীবন আরও বিস্তারে উপস্থিত। লেখক এক জায়গায় বলেছেন –

> "সরকারি চাকরিতে আমার বারোআনা কেটে গিয়েছে গ্রামাঞ্চলে। তবে, অন্য অনেকের মতো কেবল চাকরি আমি করিনি। চাকরির ফাঁকে চারপাশের মাটি-মানুষের মধ্যে ঘটেছে অবাধ বিচরণ।"[১১]

এই অবাধ বিচরণের তাগিদেই পর এসেছে নিকটে। ভকতদের মনস্তত্ত্ব, বামপন্থী কৃষক আন্দোলনের জোয়ারে ভাঙচুর হয়ে যাওয়া গৃহকোণ, সংস্কারের শিথিলতা, বিকল্প পেশার সন্ধানে নিরুদ্দেশ যাত্রা, প্রতিবাদ, খুন এই উপন্যাসে সমমাত্রায় উপস্থিত। কথাকার ভেড়া-চারোয়াদের মানসলোকে রোতাস জেলার ভোজনপুর থেকে বাঁকুড়া জেলার লোকপুরে বসতি স্থাপনের দীর্ঘ যাত্রার ইতিহাস অর্থাৎ বর্তমান জীবনের পূর্বসূত্র রচনা করেছেন। কমিউনিস্ট সরকারের সদর্থক প্রভাবে তাদের জীবনচিত্রের বদলও তুলে ধরেছেন –

> "এই মুলুকে 'কমনিশ' সরকার হয়েছে, সবাইয়ের চোখ ফুটেছে, মুখে বোল উঠেছে, সরকারি রেটে মজুরি চায়, হরেক কিসিমের সুযোগ-সুবিধে চায়, হ্যানা চায়, ত্যানা চায়।"[১২]

লোকায়ত উপাচার আগলে পড়ে থাকা প্রাচীন প্রজন্ম, আধুনিক সুযোগ-সুবিধার অন্বেষণে দ্বিধাবিভক্ত নতুন প্রজন্ম, বিহার থেকে পেটের দায়ে পালিয়ে আসা নবাগত ছেলেদের অস্তিত্বের লড়াই কোনো কিছুকেই লেখক ব্রাত্য করেননি। উপন্যাসে পরিসরের পরিবর্তে একটা সামগ্রিক ইতিহাস সৃজনই তাঁর লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

আজ রাজনৈতিক টানাপড়েন, নানা চড়াই-উৎরাই পার করে কোনোমতে ধুঁকছে 'গোঠ'-জীবন। একুশ শতকে দাঁড়িয়ে ক্রমবর্ধমান বাজারমূল্য, জমিতে অজস্র কেমিক্যাল যুক্ত সার এবং সবজিতে পেস্টিসাইডের ব্যবহার 'গোঠ'-প্রযুক্ত জৈব সারের চাহিদা হ্রাসের অন্যতম কারণ। কিছু সরকারি সাহায্য তাদের কাছে পৌঁছুলেও সেগুলি প্রয়োজনের তুলনায় যৎকিঞ্চিৎ। পঞ্চায়েতের কর্তব্য ঘরে ঘরে সরকার-সৃষ্ট প্রকল্পগুলির খবর পৌঁছে দেওয়া। আদিযুগ থেকে চলে আসা এই সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন সামগ্রিক সচেতনতা। কেবল উপন্যাস নয়, সংবাদপত্র, প্রতিবেদন, দূরদর্শনের নানা অনুষ্ঠানে সচেতনভাবে 'গোঠ' সংস্কৃতির যাপনচিত্রকে উপস্থিত করতে হবে। জনসমক্ষে এই উপস্থাপনই সর্বতোভাবে তাদের জীবন যন্ত্রণাকে সাধারণ মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে সক্ষম। মানবতার জয়গান ঘোষণা করে মানুষের পাশে, মানুষের স্বার্থে এগিয়ে আসতে হবে মানুষকেই। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সাধারণ মানুষের সহমর্মী সম্মিলিত প্রয়াসই পারে পিছিয়ে পড়া এই শ্রেণিটিকে স্বমহিমায় মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে।

Reference:

১. রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, গান, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৩৮০
২. তদেব, পৃ. ২০০
৩. নজরুল-গীতি, অখণ্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৩৬৩
৪. মিশ্র, ভগীরথ, দুটি উপন্যাস, চারণভূমি, দে'জ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৬
৫. তদেব, পৃ. ১৭
৬. তদেব, পৃ. ৯৭-৯৮
৭. তদেব, পৃ. ১০৩
৮. তদেব, পৃ. ১৪৪
৯. দ্র. ঝুমা রায়চৌধুরী, কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু : সামগ্রিক মূল্যায়ন (১ম খণ্ড), পূর্বাশা, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ২৩৪

১০. চক্রবর্তী, অলোক, সৈকত রক্ষিতের উপন্যাস : পুরুলিয়া-দর্পণে ভারত-দর্শন, কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত, (স. অরূপ পলমল), ডাভ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১০৪

১১. দ্র. ভগীরথ মিশ্র, পরিবর্তমান গ্রামসমাজ : গল্পকারদের ভাবনা (সংকলক- শ্রাবণী পাল), অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা ২০১১, পৃ. ১৮

১২. মিশ্র, ভগীরথ, দুটি উপন্যাস, চারণভূমি, দে'জ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৪৮